KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 73, Nehru Colony, cal-40
Collection : KLMLGK	Publisher : Tapon Sen Gupta
Title : অতনুকথা	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : বই মেলার সংখ্যা	Year of Publication : ফাল্গুন ১৪১৩
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : Barun Chakraborty	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

নন্দিনী

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রোত্তর ছোট কবিতার জগৎ—২ ১-৯

এই বাংলার কবিতাগুচ্ছ—১

বিজন জোয়ারদার-১০, প্রফুল্লকুমার দত্ত-১১, শোভন বিশ্বাস-১১, সুকুমার ভট্টাচার্য-১২, অমিতা দত্ত-১২, গীতশ্রী গোস্বামী-১৩, শুভ্রা সাহা-১৩, পার্থ সেনগুপ্ত-১৪, আশিস চক্রবর্তী-১৪, সৈয়দ কাওসর জামাল-১৫, তারা ভট্টাচার্য-১৫, সোমনাথ কোলে-১৬, স্বদেশরঞ্জন দত্ত-১৭, রেখা দত্ত-১৭, অনল চৌধুরী-১৮, জয়কৃষ্ণ দাস-১৮, তপন সেনগুপ্ত-১৯, নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-১৯।

শতবর্ষে নেতাজীকে নিবেদিত

রবীন চক্রবর্তী-২০, প্রদীপ সাহা- ০।

এই বাংলার কবিতাগুচ্ছ—২

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-২১, শশধর ভট্টাচার্য-২১, দেবব্রত দত্ত-২২, রতন চট্টোপাধ্যায় ২২, অমরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধন-২৩, রাজা রায়-২৩, অনুপ্রিতা বর্দ্ধন-২৩ সত্য বসু-২৪, ডলি দত্ত-২৪, চিত্রা অধিকারী-২৫, কৃষ্ণা রায়-২৫, মিতশ্রী নাগ-২৬, গালিব ইসলাম-২৬, রমিতা মজুমদার-২৬, রবীন চক্রবর্তী-২৭, গৌরীশংকর সরকার-২৭, দীপককুমার গুপ্ত-২৮, প্রেমাংশু দে-২৮, পাঁচুগোপাল রায়-২৯, চন্দনকুমার বৈদ্য-২৯।

বাংলা দেশের কবিতা

আশরাফুল মান্নান-৩০, আমিরুল হক-৩০, ইমাসুর রশীদ-৩০, মহিবুর রহিম-৩১, যাকারিয়া খান-৩১, মোহাম্মদ ওয়াহিদ আসিফ-৩১।

সম্পাদকীয়

বরুণ চক্রবর্তী-৩২

সম্পাদক—বরুণ চক্রবর্তী

কার্যালয়-৩/৭৮, আজাদগড়, কলকাতা-৭০০০৪০

ফোন-৪৭১-৭৬৯২

রবীন্দ্রোত্তর ছোট কবিতার জগৎ / প্রফুল্লকুমার দত্ত

উপস্থাপনা

এবারের আলোচ্য কবিবৃন্দ তাঁরাই যাঁদের আবির্ভাবকাল ১৯১১ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ চাল্লিশের কবি হিসেবে যাঁরা চিহ্নিত। তথাপি ওই সময় সীমায় উদ্বুদ্ধ সব কবিকে এই আলোচনায় আনা সম্ভব হয়নি, এই কারণেই—তাঁদের সকলের ছোট মাপের কবিতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আবার সব কবির যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ আমার সংগ্রহে আছে বলেও আমি দাবী করি না। আমার অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি অবশ্যই ক্ষমার্হ।

দ্বিতীয় দশকে আবির্ভূত কবিবৃন্দ

১. দিনেশ দাস (১৯১৫)

'কাস্তে' কবি হিসেবেই স্বনামধন্য কবি দিনেশ দাস—সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং কবিতার প্রতি সহৃদয়তায়, তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁর নামটি ভিন্ন মাত্রায় উচ্চার্য। বামপন্থা মনন সমৃদ্ধ হয়েও প্রেম বিষয়ক কবিতায় তিনি বৈষ্ণবীয় সহজিয়াপন্থী। তাঁর একটি প্রেমের কবিতা এখানে উপস্থাপিত হোল, যা সমাজ-প্রেম তথা বিশ্বপ্রেমেরই অভিব্যক্তি।

একটি হৃদয়

আকাশ-সমুদ্র নিয়ে বোবা কালা মেয়ের মতই
পৃথিবী ঘুরপাক খায় সময়ের ঢেউ চলে যায়।
স্মৃতির তরঙ্গ হয়ে আসে ঘুরে ঘুরে
জীবনের বালিয়াড়ি জুড়ে।
পৃথিবীর যত দুঃখ আমার হৃদয়ে এসে জমে ঃ
প্রাণের পল্লব যেন নুয়ে পড়ে বেদনার ভারে থমথমে।
তবুও আমার শেষ ভালোবাসাটুকু জীবনের অন্তিম সন্ধ্যায়,
ভাসিয়ে দিলাম এই লবণাক্ত সময়ের ঢেউয়ের উপরে,
ছড়িয়ে দিলাম আজ একটি হৃদয় ॥

এ যেন আত্মত্যাগ। আপামর জনসাধারণকে জীবন দিয়ে ভালোবাসা। মানব জীবনের 'অন্তিম সন্ধ্যায়' ভালোবাসা ছাড়া আর কী?

২. সমর সেন (১৯১৬)

সমর সেন যেন তুলির সাহায্যে কবিতা আঁকতেন। তাঁর তিনটি ছোট চিত্র এখানে আলোচিত হচ্ছে।

ক. বিরহ

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে।
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।
তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এলো ঃ পশ্চিমের করুণ আকাশ।
গন্ধে ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি ॥

খ. প্রেম

বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে
তোমাকে পাবার বাসনা।
আর মাঝে-মাঝে আকাশে হলুদ রঙের অদ্ভুত চাঁদ ওঠে,
চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের পাতায়,
আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে' থাকে অলস স্বপ্নের মতো।
সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে'—
তোমাকে পাবার বাসনা
বিষাক্ত সাপের মতো।

গ. তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।
আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?
তুমি যেখানেই যাও
আকাশের মহাশূন্য হতে জুপিটারের তীক্ষ্ম দৃষ্টি
লেজার শুভ্র বুকে পড়বে ॥

প্রথম কবিতাটিতে রজনীগন্ধার শুভ্রতা বড় নিষ্পাপ, বৈধব্যের প্রতীক।

বিরহ মানেই তো বৈধব্য-বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা। মাত্র সাতটি চরণে চিরন্তন বিরহের ছবি আঁকা হয়েছে।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে প্রেমের আড়ালেই প্রেমিক প্রেমিকার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। বিষাক্ত সাপের ছোবলে যে মাদকতা, যে অচেতনতা—প্রেমের ছোবলে তাই-ই। 'চঞ্চল বসন্ত কাঁপে গাছের ছায়ায়'—লুপ্তোপমার এহেন আর একটি উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে বিরল। আর এই লুপ্তোপমাই প্রেমের না-দৃশ্য অস্তিত্বকে ব্যক্ত করছে।

তৃতীয় কবিতাটিও প্রেমের কবিতা। প্রেমকে অগ্রাহ্য করে, প্রেমিককে উপেক্ষা করে প্রেমিকা যেখানে যাবে, সেখানেই তার অপমৃত্যু।

৩. হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭)

চতুর্থ দশকের উল্লেখযোগ্য কবি হরপ্রসাদ মিত্র। সমাজ সচেতন কবি, কঠোর বাস্তববাদী হয়েও প্রেম বিষয়ক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর একটি কবিতা এখানে তুলে দিচ্ছি, যেটি গদ্যছন্দাশ্রিত হয়েও অনবদ্য একটি প্রেমের কবিতা।

ক. গোধূলিতে

গোধূলিতে আকাশ হল নীল
নিঃসঙ্গ একটা গাছের মাথা
ছাদের সমান উঠেছে—
পূর্ণিমার সমুদ্রে সুদূর অস্পষ্ট এক দ্বীপ !
হঠাৎ মনে পড়ে
কবে দেখেছি তাকে রোগশয্যায়,
কালো পাহাড় থেকে নেমে আসা
শীর্ণ একটি জলের ধারা।

নিঃসঙ্গ একটা গাছ, অস্পষ্ট এক দ্বীপ—প্রেমিকেরই প্রতীক। আর কালো পাহাড় থেকে নেমে আসা শীর্ণ জলধারা প্রেমিকার প্রতীক। অতি সংক্ষেপে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে' ধরার প্রচেষ্টা।

৪. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮)

বামপন্থা মনন সমৃদ্ধ কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের তিনটি ছোট মাপের কবিতা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক. রাতে তুই এসেছিলি

রাতে তুই এসেছিলি, ভোর হতে না হতেই
নিয়ে গেলি পদ্মকোষে বিষাক্ত অঙ্কুর।
কেবল যাবার আগে রেখে গেলি দুটি ম্লান চোখের করুণা।

সকালে দুপুরে রৌদ্রে নির্জন বিকেলে
মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়,
হাত পাতে কিশোর ভিক্ষুক।
ধক্ করে ওঠে বুক, কিশোরের দুটি চোখ যেন
কান্না ভেজা অবিকল সেই দুটি চোখের আদল ।।

খ. লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই
আবার কবন্ধ অন্ধকার ভিড় করে আসবে।
মনে রেখো
রক্তাক্ষরে প্রতিশ্রুতিগুলো লিখে
তুমি সবাইকে পাড়িয়েছিলে ;
সূর্যের দিকে তাকিয়ে
নদীর দিকে মুখ রেখে
তুমি নতুন যাত্রার কথা শুনিয়েছিলে ।।

গ. কথাগুলো

কথা শুনতে শুনতে কথা শুনতে শুনতে
অনেক বছর পার হয়ে গেল।
এখন শব্দগুলো কানে এলেই গা জ্বালা করে,
চোখে জ্বলতে থাকে ঘৃণা।

বানানো কথা এত কুৎসিত হয়।
একবার আগুন জেলে দিতে পারলেই
অবাধ্য পোকাগুলোর হাত থেকে
রক্ষা পাওয়া যায় ।।

'রাতে তুই এসেছিলি'—মাত্র আট পংক্তির এই কবিতাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে—বর্তমান সমাজের অতি করুণ একটি ছোট গল্প। একদা এক যুবতী জীবিকার দায়ে এসে ছিল এক যুবকের ঘরে। তার পর—'কেবল যাবার আগে রেখে গেলি দুটি ম্লান চোখের করুণা।' পরবর্তীকালে একদা এক কিশোর ভিক্ষুক এসে হাত বাড়িয়েছে সেই নায়কেরই সামনে। নায়ক দেখছেন—'কিশোরের দুটি চোখ যেন / কান্না ভেজা অবিকল সেই দুটি চোখের আদল।' এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী ঘটনাগুলি সাজিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সমাজ সচেতন পাঠক সমাজের।

'লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই' মানবিক পতন ঘটে। তাই, এ-আত্মকথন। রক্তাক্ষরে

প্রতিশ্রুতি' নিজের কাছেই। কবির প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রুতির চেয়ে ভয়ংকর। কবির প্রতিশ্রুতির সাক্ষী সূর্য ও নদী। এখানে 'সূর্য' ও 'নদী', দুটি অভিধাই প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত। সূর্য, তৎকালীন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ; আর নদী, পূর্বাপর জনগণধারা। কোনো কবি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে এই সূর্য ও নদী, এঁরা ক্ষমা করবেন না।

'কথাগুলো' কবিতাটি রাজনীতি সচেতন মননপ্রসূ এক প্রতিবাদ। কিরণশংকর বর্তমানের বিকৃত রাজনীতিজ্ঞদের প্রতি তাঁর চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এই অতিক্ষুদ্র অবয়বের কবিতাটি মাধ্যমে। ওঁদের 'বানানো কথা এত কুৎসিত হয়' বলেই ওই অবাধ্য পোকাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়' যে আগুন জ্বালিয়ে, সেই বৈপ্লবিক আগুনেরই নাঁচকেতা কবি কিরণশংকর।

৫. মণীন্দ্র রায় (১৯১৯)

ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যমনস্ক অথচ বামপন্থা দরদী, প্রতিবাদী কবি মনীন্দ্র রায়ের কবিতা সুশিক্ষিত বাঙালী পাঠকবৃন্দের কাছে আদরণীয়। তার উপমা, প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প্য—সবই স্বদেশী, তাই সহজ বোধগম্য। দশদিগন্ত বিস্তৃত প্রাজ্ঞ মনীন্দ্র রায়ের কেবলমাত্র প্রেম-বিষয়ক দুটি গীতিকবিতাই এখনো আলোচিত হচ্ছে।

ক. কমলালেবু

রাত্রির বীভৎস অন্ধকার
লালসা ও গুপ্তহত্যার পর
পিপাসা যখন হয়ে যেতে থাকে
ভারী কয়লার নিকষ দুঃস্বপ্নে,
তখন, ঠিক তখনি,
জন্ম নেয় একটা লাল কমলালেবু
উর্ধ্বমূল আকাশবৃক্ষের একটি মাত্র ডালে।

খ. মনে পড়ে

কবে যেন এক সাতাশে ফেব্রুয়ারী
কে বুঝি হঠাৎ চলে এসেছিল বাড়ি,
দমকা হাওয়ায় ক্যালেন্ডারের পাতা
মাথা কুটেছিল দেয়ালের আড়াআড়ি।

মনে পড়ে সেই সাতাশে ফেব্রুয়ারী,
কেউ আর আজ ভুলেও আসে না বাড়ি।
সময়ের ভারে ক্যালেন্ডারের পাতা
স্মৃতির দেয়ালে ঝুলে আছে আড়াআড়ি ।।

প্রথম কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। কবিতাটি পড়ে মনে হোতে পারে—এহেন সেই চর্যাপদের মোহিনী-আড়ালে 'কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল' এর কোনো একটি ডালে দোদুল্যমান একটি 'কমলালেবু'। কিন্তু পরক্ষণেই উপলব্ধি করা যায়—'উর্ধ্বমূল আকাশবৃক্ষ', 'রাত্রির বীভৎস অন্ধকারে' অচলায়তন ভারী কয়লার নিকষ দুঃস্বপ্নের 'যাবতীয় অনাচারের বিপরীত পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আর তারই লাল কমলা লেবুটি রোগক্লিষ্ট মানুষের সঞ্জীবনী। এখানে 'লাল' বিশেষণটি দ্ব্যর্থক।

দ্বিতীয় কবিতাটি বিশ্লেষনের অপেক্ষা রাখে না। চারটিমাত্র পংক্তি পুনরাবৃত্ত হয়ে আট পংক্তিতে নিবদ্ধ। অভূতপূর্ব শিল্প সমন্বয়! বিশেষ কোনো এক সাতাশে ফেব্রুয়ারী মাত্র যেন দুবারই আবির্ভূত। প্রথমবার কে একজন এসেছিলেন; আনন্দের 'দমকা হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারে পাতা / মাথা কুটৈছিল দেওয়ালের আড়াআড়ি।' আর দ্বিতীয়বার কেউ আসেননি, তাই 'ক্যালেণ্ডারের পাতা / স্মৃতির দেয়ালে ঝুলে আছে আড়াআড়ি।' এই কবিতাটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'ক্যালেণ্ডারের পাতা' যেখানে আবৃত রয়েছে কবির একান্ত 'সাতাশে ফেব্রুয়ারী'। জগতে কোন্ মানুষের জীবনে নেই এমন কোনো বিশেষ দু একটি তারিখ? চর্যাপদের রহস্য উদ্‌ঘাটনে আমরা সক্ষম না হোলেও, আমাদের অনুভূতি কিন্তু মনীন্দ্র রায়ের অনুসরণে সক্ষম।

৬. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন, ইতিহাস সচেতন তাৎক্ষণিক ভাবনায় ভাবিত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সমকালীন যে কোনো ধারা তরঙ্গে আন্দোলিত তিনি তাঁর তাৎক্ষনিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন অসংখ্য ছোট মাপের কবিতা মাধ্যমে। সে সবের মধ্য থেকে মাত্র দুটি ছোট কবিতা এখানে আলোচিত হচ্ছে।

ক. মানুষ

তার ঘর পুড়ে গেছে অকাল অনলে;
তার মন ভেসে গেছে প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ দেখে চমকায়,
এখনো সে মাটি পেলে প্রতিমা বানায়।

খ. ধিক্কার দেবার আগে

কার কাছে ফ্যান ভিক্ষা চাও?
আমিও যে অন্নের ভিক্ষুক,
দিন আনি কিন্তু দিন খাওয়া…
তোমার আমার সকলেরই
ভিতরে একটি কান্না। তুমি দুই হাতে
পা জড়াতে চাও;
তবে আমি কার পা জড়িয়ে ভিক্ষা চাইবো?
ধিক্কার দেবার আগে কথার উত্তর দিয়ে যাও॥

'মানুষ' তার ঘর পুড়ে গেলে, বা মন ভেসে গেলেও সে 'মাটি পেলে প্রতিমা বানায়' বলেই তো সে মানুষ পদবাচ্য।

'ধিক্কার দেবার আগে' ফ্যান ভিক্ষুককে কবি বলছেন—'আমিও যে অন্নের ভিক্ষুক'—'আমি কার পা জড়িয়ে ভিক্ষা চাইবো?' কবির এই 'কথার উত্তর দিয়ে যাও।' পাঠকের কাছেও এর উত্তর নেই।

৭. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০)

যতোটা অবয়বের ছোট কবিতা এই প্রবন্ধে আলোচ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ততোটা ছোট অবয়বের রচনা সংখ্যা নগণ্য। তথাপি একদা বঙ্গভঙ্গ জনিত যন্ত্রনায় জর্জরিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটি অসাধারণ ছড়া কবিতা লিখেছিলেন যা আবালবৃদ্ধবনিতা পাঠকসমাজকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলো। সেটি এখানে আলোচিত হচ্ছে।

পারাপার

আমরা যেন বাংলা দেশের চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—থাকুক সে পাহারা!
দুয়োরে খিল। টান দিয়ে তাই খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলা দেশ এপারেও সেই বাংলা॥

স্বল্প পরিসরে রূপক ও উপমার ঠাসাঠাসি ভীড়। এখানে বাংলা যেন পূর্ণাঙ্গ এক মানব দেহ। উত্তমাঙ্গের 'মাঝখানে নাক উচিয়ে আছে' তাই এক চোখ আর এক চোখকে দেখতে পাচ্ছে না। অথচ দুটি চোখ একই দেহের। সুতরাং ওই পাহারাদার নাকটিকে উপেক্ষা করেই, সীমান্ত দুয়ারের খিল অগ্রাহ্য করে 'খুলে দিলাম জানলা' এবং প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম—'ওপারের যে বাংলা দেশ এপারেও সেই বাংলা।'

এখানে 'চোখের দুটি তারা'—'নাক'—'দুয়ার'—'খিল'—'জানলা'—এসবই প্রতীক; আর সম্পূর্ণ বক্তব্যটির রূপকাশ্রয়ে আমাদের অবিভক্ত বাংলা।

৮. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০)

চতুর্থ দশকের সর্বশেষ এবং ঘরকুণো কবি-শিরোমণি কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কবিতার আঙ্গিক দিকটি ছেড়ে দিয়েও বলা যায়—আঙ্গিক পরিকাঠামোর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইনি সফলকাম কবি। মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে, দলবৃত্ত ও কলাবৃত্ত রীতির সার্থক সংমিশ্রণের প্রবর্তক মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরনের দুটি ছোট মাপের কবিতা এখানে আলোচিত হচ্ছে।

ক. সেকাল-একাল

যৌবনে স্থিতধী, পুরু পরকলা ও বই-বাৎপাচ্ছন্ন ছিল চোখ
অথচ হৃদয় দুটো কান হয়ে থাকত পদশব্দ-সংগ্রাহক
তখন উৎসুক ভীরু আলতো হাতে দোর ঠেলতে ফিরে যেতে আজ
তুমিই সংসার কেন্দ্রে আমি আবর্তন, আমি তোমার সমাজ
মাঝে মাঝে ভাঙতে চাই খুললে ওই মনের দরোজা, তুমি স্থির
দৈনন্দিন দৈন্য আর প্রাত্যহিক প্রীতি রীতি নিরুৎসুক নীড়।
না কি ও পরকলামাত্র, তুমি দুটো চোখ, চোখে সেকালের হাতছানি ঝলক ?

খ. তাকাতুমই না

মেঘ না-চাইলে আকাশের দিকে তাকাতুমই না,
দিতুম না ডুব রূপে রোদ্দুরে একা তুমি না
হাসির শরীরে ছোঁয়ালে ঈষৎ ফুঁপিয়ে ওঠা।
ঝরে যাওয়াটুকু দাগা না দিলে কি ফুলের ফোঁটা
মনে আঁকতুম, বুকে রাখতুম জীবনটাকে
যদি-না কঠিন ঘা দিয়ে বাজিয়ে নিতে আমাকে ??

প্রথম কবিতাটি অনবদ্য মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে রচিত, দ্বিতীয়টি কলাবৃত্ত রীতির ছয়কলা মাত্রা পর্ববন্ধে রচিত। দুটি কবিতাই অন্ত্যানুপ্রাস প্রযুক্ত।

প্রথম কবিতাটির—পরকলা, থাকতে, আলতো, ঠেলতে, ভাঙতে, খুললে ও হাতছানি প্রভৃতি, অক্ষর গুনতিতে যা দাঁড়াবে, তার চেয়ে একমাত্রা কোরে কম অক্ষরে ধার্য এই শব্দগুলি, অক্ষরবৃত্ত তথা মিশ্রবৃত্তছন্দে প্রযুক্ত। অর্থাৎ হস্ চিহ্ন-আক্রান্ত বর্ণকে মাত্রা মর্যাদা না দিয়ে মিশ্রবৃত্তের 'শোষক ক্ষমতা' (রবীন্দ্রনাথ) বজায় রাখা হয়েছে। মঙ্গলাচরণের শেষ চরণ-আধৃত 'পরকলা-মাত্র' শব্দটির কলামাত্রায় সাত এবং দলমাত্রায় চার হিসেবে প্রযুক্ত। কিন্তু মঙ্গলাচরণ এই সাতমাত্রা ও চারমাত্রাকে সচ্ছন্দে বেঁধেছেন পাঁচ মিশ্রমাত্রায়। দল-কলা সমন্বয়ে যে মিশ্রমাত্রা, তার সার্থক প্রয়োগ এই শব্দটিতে। এই কবিতাটির প্রতিটি চরণের পর্বান্বয়ও (পর্বের চাল-চলন) একেবারে সঠিক, ছন্দোবিজ্ঞান সম্মত।

'তাকাতুমই না' কবিতাটির আঙ্গিক সৌন্দর্যের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারেন কোন্ প্রাজ্ঞ কবি ছান্দসিক ? নিখুঁত ছয় কলা মাত্রার পর্ববন্ধে রচিত এই কবিতাটির প্রতি চরণে সমমাপের (ছয়কলা মাত্রা) তিনটি করে পূর্ণ পর্ব। অথচ চরণান্তিক, অন্ত্য অনুপ্রাসযুক্ত পর্বগুলিকে অনভিজ্ঞেরা মনে করবেন—পাঁচ কলা মাত্রার এক একটি অনুপর্ব তথা ভগ্নপর্ব। কিন্তু তা নয়। পর্বান্তিক শেষ বর্ণগুলির আ-কার, এ-একার (না) দুই কলামাত্রায় নিবদ্ধ। ঠিক সংস্কৃত ছন্দের অনুবর্তী উচ্চারণ, যার ফলে অন্ত্যানুপ্রাসগুলি সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগ্রাহ্য

হয়েছে। এযেন কান ধরে টেনে নিয়ে কানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়া।

এবারে কবিতা দুটির আঙ্গিক বিষয়ে দুচার কথা বলছি। দুটি কবিতাই প্রেম-কেন্দ্রিক। প্রথমটিতে প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের জীবনেরই দুটি পর্যায়ে উভয়ের সঙ্গে মিলনেচ্ছু আবেগ-কম্পিত ব্যবধানে নিবদ্ধ। নায়ক পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত ; চোখের সামনে বই, কানের পাশে নায়িকার পদশব্দ। দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্ণ যৌবনা নায়িকা সংসার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির, নায়ক তার বৃত্তের পরিধিতে আবর্তিত এক প্রৌঢ়। তখন 'দৈনন্দিন দৈন্য আর প্রাত্যহিক প্রীতি রীতি নিরুৎসুক নীড়।' পূর্বাপর ব্যবধানের শূন্যস্থল। দ্বিতীয়টিতে এক দার্শনিক সত্য প্রতিষ্ঠিত। মেঘ আছে বলেই আকাশ দেখতে হয়, কান্না প্রযুক্ত বলেই হাসির উপলব্ধি, ঝরে যাওয়ার বেদনাবিধুর ফুলের ফুঁটে ওঠায় সার্থকতা এবং প্রেমিকা প্রেমিকের জীবনকে কঠিন আঘাতে বাজিয়ে রাখে বলে জীবনের সার্থকতা ! এই সার্থকতার মোহ না থাকলে আমরা ওসব দিকে 'তাকাতুমই না।'

অতন্দ্রপথ—বৈশাখ ১৪০৪ সংখ্যায় আলোচিত হবেন সেই সব কবিবৃন্দ, যাঁদের আবির্ভাব কাল ১৯২১ থেকে ১৯৩০, অর্থাৎ পঞ্চাশের কবি হিসেবে যাঁরা স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, তাঁদের মধ্যেও যাঁদের ছোট মাপের কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, কেবলমাত্র তাঁরাই সেই আলোচনায় আসবে।

সম্পাদক 'অতন্দ্রপথ'।

।। এই বাংলার কবিতা গুচ্ছ ।।

ছায়ার রঙ / বিজন জোয়ারদার

ইদানিং ক্ষণে ক্ষণে নিজের ভেতরে নামি ; কোথাও তলিয়ে যেতে চাই
এই এতটুকু ঘরে নিজের ছায়াকে চেয়ে দেখি ।
পলকে পলকে এই ছায়া কতবার
রঙ বদ্‌লায় !
কখনো নরম শান্ত মেঘছাড়া আকাশের মতই সুনীল
কখনো বা ফাল্গুনের নতুন পাতার মত সতেজ সবুজ—
আর ঠিক পরক্ষণে রাগী উত্তরীয় ধারী ক্রুদ্ধ কাপালিক
দুটো চোখ অহংকারে গাঢ় রক্তলাল !

তারপর কি যে হয় কেন হয় সব রঙ একাকার হয়ে শুধু কালো
ঘোর ঘন কালো হয়ে যায় ।
তখন আমার বড় ভয় করে, তাই
সন্ত্রাসে শিউরে উঠি ; কেঁপে উঠি আপাদমস্তকে ।
বুক-ফাটা বোবা কান্না ভেসে আসে স্নায়ু শিরা ছিঁড়ে···

হঠাৎ চিৎকার করে উঠি ঃ
নিষ্ঠুর নির্মম ছায়া এত রঙ দ্যাখালে আমাকে
কিন্তু সাদা কই ?
সাদা রঙ দ্যাখাবে না ? সাদা রঙ কোথাও কি নেই ?
সাদা মিথ্যে মনগড়া অস্তিত্ব বিহীন ?

হঠাৎ অবাক হয়ে শুনি : সেই ছায়া
আমার নিজেরই ছায়া কানে কানে বলে ঃ
সাদা চাও ? সাদা বড় দুর্লভ বিরল
তবু যদি পেতে চাও, এসো এসো আরো নেমে এসো
অতলান্তে নেমে এসো । মগ্ন হও মগ্ন হয়ে থাকো ।
এখানেই সাদা থাকে । এখানেই আছে ভালবাসা
থৈ থৈ জ্যোৎস্নায় সদ্যফোটা রজনীগন্ধার
গন্ধের মতন সে যে নীরবে নিভৃতে ভেসে থাকে···

অন্য রঙ এখানে বাঁচে না···
বাঁচতেই পারে না···॥

স্বদেশ / প্রফুল্লকুমার দত্ত

গৃহী চায় মাটি, গৃহ, গৃহিনী, সন্তান ;
সন্ন্যাসী প্রত্যাশী পথ ক্রমবর্ধমান ।
আমি গৃহী নই, আমি সন্ন্যাসীও নই—
ভাসমান দ্বৈপায়ন । গৃহের হই-চই
কান পেতে শুনি, শুনি পথ-কোলাহল—
দুদিকে আমার দুপা ; মধ্যে স্রোতস্বল
নদী, তুমি স্নেহময়ী, নিয়ে চলো আজ
সেই জন্মভূমি-দ্বীপে, কুমারীমস্তাজ
আমাকে ডাকেন তাঁর হৃদয়-স্পন্দনে ।
না-গৃহী না-সন্ন্যাসী, এ-কবি মাতৃতনে
বঞ্চিত ! প্রফুল্ল-চিত্ত দুঃখে স্থানুবৎ ।
নিয়ে চলো সেই দ্বীপে, জন্মান্ধ জগৎ
যেখানে পথের শেষ, আসা যাওয়া শেষ,
গৃহহীন এ-কবির সেটাই স্বদেশ ॥

ওদের বিকালগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে / শোভন বিশ্বাস

কি এক বদ্ নেশায় ওদের সুন্দর বিকালগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে ।
দিন যায় শুধু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়
বয়স বাড়ে, বয়সের ক্ষিধে বাড়ে
সময়ের সীমা কমতে থাকে ।
ওরা জানতে চায়না কালো চুল সাদা হলেও
বিলাস নেশার যন্ত্রণা আরো বাড়ে ।
নিঃশ্বাস ফুরাতে চায়—
অবাস্তব স্বপ্নাতুর রাতের জালে স্ফূর্তি খোঁজে ।
লোলুপ কামনার ইশারায় স্ফীত বাসনার উদ্দাম হাতছানি
ওরা ছুটছে কিন্তু মর্মান্তিক অনিবার্য মৃত্যুর দিকেই ।
যন্ত্রণা আসছে, চিতা হাসছে
মিথ্যাচারিতার রসিক পুতুল
তবু তাদেরই বুকে নাচছে ।
কি এক বদ্ নেশায় ওদের সুন্দর বিকাল গুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে ॥

কাঁটা তারের বেড়া / সুকুমার ভট্টাচার্য

সীমান্তের ওপারে রূপসী বাংলা
হরিদাস পুরের এপারে ভারতীয় সংস্কৃতি
মাঝখানে দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া
আবার কোথাও বহতার বুকচিরে
চিহ্নিত সীমানা।
কিন্তু অম্হির বাতাস এসব কিছু মানে না
এপার থেকে নিয়ে যায় জলদ মেঘ
ছিটিয়ে দেয় শুষ্ক বীজ মুখে
শুরু হয় সবুজ বিপ্লব
আবার জ্বলন্ত সূর্য—আবেগী চাঁদ
পায়ে পায়ে চলে আসে আলোর মিছিলে
এপার বাংলায়।
ওরা মানেনা সরকারী হুকুমনামা
ওদের হাতে নেই কোন আইনি কাগজ
আছে সংহতির স্বরলিপি
সীমানা লঙ্ঘন করে গাঙচিল
উড়ে যায় গঙ্গা থেকে পদ্মার বুকে
পড়ে থাকে সীমান্তের যাবতীয় আইন
নির্বোধ এক সভ্যতার কাছে।

বাংলা ভাষা / অমিতা দত্ত

আমাদের গর্ব ও আশা। বাংলা ভাষা।
ঝরেছে কত রক্ত, রাখতে প্রিয় মাতৃ ভাষা
তেমনি আমরাও আছি ঋণী।
এ নিয়ে তো চলে না কোন বিকিকিনি
শুধু স্মরণে রাখি যেন সেই সব জনের।
যাঁদের আত্মত্যাগে পূর্ণ হয়েছে ভাণ্ডার
জানি—শুধু এটুকুই নয়, তাদের, প্রাপ্য।
যেন দেতে পারি তাঁদের সম্মান।

জোড়া যন্ত্রণা / গীতশ্রী গোস্বামী

ওরা দুজন চেনা ভীড়ে শেষপ্রান্ত
একপেশে রোদ্দুর দেয়নি ছিঁটে ফোঁটা আলো
ঝরে গেছে চুল মেদ হাঁস
আগে পিছে গোয়ালের ভনভন।
নজরকাড়া রসদহীন ভাঙা অবয়ব।
আঙ্গুলের মোটা দাগে ভরে দেওয়া দেয়ালের পিঠ
সৃষ্টিসুখে ভুলে যায় কারা এলো গেল
কত গাড়ি কত রঙ, তবু ভাবনা
চকচকে মাথা হাঁটু বেয়ে মাটি ছোঁয় তখন।
বড় হিসেবী হয়েছে দিন
সাবধানী মালিকানা তাড়িয়ে নেয় রুখা ঘাটে
জোড়া যন্ত্রণা বেজোড় হিসেবে ঘোলা জলেই খোঁজে উপায়
জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে যায় সুখটান।

অপেক্ষা / শুভ্রা সাহা

দিন রাত্রির কোলে জড়ো করা জীবন
কত সহজেই পার হয়ে যায়।
আজ মুখোমুখি সময়
কার খোঁজে নিরন্তর নিমগ্ন ?
যদি অকলঙ্ক ভোর, সূর্যের তেজে দীপ্যমান দিন
সায়াহ্নের সন্ধ্যাতারায় জ্বলজ্বলে আকাশ
আর অফুরন্ত ভালবাসা
ফুটে ওঠে অগুনিত মুখে
সে দিনের অপেক্ষায় আমি থাকতে পারি অনন্তকাল।

হিংসার ফুটিফাটা মাঠে ফোটে না টিউলিপ,
হাতে হাতে মিলনের সুরে ভরে না বুকের পাঁজর।
বিষাক্ত বারুদের গন্ধে কাঁপে বিপন্ন রাত,
কার স্খলিত বিষে নীল হয় জীবনের উৎসব
বুঝিনা কীভাবে টেনে চলি বছর—
হিসাবে গরমিল নেই তবুও গরমিল খাচার।
আমি ভেতর থেকে বেড়িয়ে এসে বলি
অকলঙ্ক ভোর, অনিকেত জীবনের
অপেক্ষায় থাকব অনন্তকাল ?

এবং ইন্দ্রজাল / পার্থ সেনগুপ্ত

এগুলো শেষের কথা
যা শুরুই হয়নি
এত অন্ধকার কেন ?
ফুল, পাখী, মাঠ ও দিগন্ত ছেড়ে
কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি
ও মা, এত জল কেন ?
এত গভীর, আমার সারাটা শরীর
হিম হ'য়ে গেছে
কোথাও থামব তারপর ভেসে উঠব আবার
কাল সারাদিন মাকে দেখিনি
অনেক খুঁজেছি, অনেককে জিজ্ঞাসা ক'রেছি
তারা কেউই আমার মাকে দেখেনি
তারপর ধর ছেলেবেলার কথা
আমিত' "ইন্দ্রনাথ" হ'তে চেয়েছিলাম
"শ্মশানে" 'অন্নদাদি' "শ্রীকান্ত" এই সব
ভরা নদী তরী ডুবিয়ে দিয়েছে।
এই ধর আমি আছি—তাকাও
দেখ ইন্দ্রজাল ভ্যানিস
খুঁজেও পাবে না কোথাও।

তুমি বাংলাদেশ / আশিস চক্রবর্ত্তী

আমার বাড়ি ধূপের কাঠি, তোমার বাড়ি গন্ধ।
সেই কবে যে ভাগ হলো সব, জাগ্রত অতন্দ্র।
আমার বাড়ি ফুল ফুটলে পাও তুমি সুবাস,
ভাগাভাগি করে তোমার মিটলো মনের আশ ?
আমি যদি হৃদয়, তবে তুমি যে তার শ্বাস।
বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই 'আমার বাড়ি যাস্।'
আমার বাড়ি তোমার বাড়ি মাঝে ছোট্ট খাল,
তুমি আমি দুই বিদেশী, মাঝে লোহার জাল।
তোমার আমার হাত বাড়ানো, আইন করে মানা।
গঙ্গা আছে পদ্মা আছে, মাঝখানে সীমানা।
আমার বাবার নিজের দেশ, আমারই বিদেশ
আমি ভারতবর্ষ হলে, তুমি বাংলা দেশ।

শীতের চিঠি / সৈয়দ কওসর জামাল

শীতের সন্ত্রাস যত বাড়ে, পাতাদের ঝরে যাওয়া
আরো প্রতিবাদময়
ওই যে হলুদ রং ক্রমশই ম্লান হতে হতে
টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সে-ও এক ক্রোধে
এই ক্রোধ সঞ্চারিত হতে থাকে হাতের ভিতরে
নক্ষত্র-তারকা কেঁপে ওঠে—
শীতের কম্পন নিয়ে আমি একদিন গ্রাম ছেড়ে
শহরে এসেছি
উত্তরের হাওয়া তবু ছাড়েনি আমাকে
যেখানেই যাই আমি, উপস্থিতি টের পাই তার
যেকোন প্রণয়দৃশ্যে, আগুনের যে কোন সংযোগে
ঢুকে পড়ে রক্তহিম হাওয়া
ল্যামপোস্টের নিভুনিভু চোখগুলি শুষে নেয় আলো

শীতের আর্দ্রতা নিয়ে বাঁচি, মধ্যরাত
হাওয়ার কম্পন নিয়ে বাঁচি, সূর্যোদয়
অন্ধত্বের স্নায়ুচাপ নিয়ে বাঁচি, নীলাভ কুয়াশা
শুধু মরতে চাই আমি তোমার চোখের স্পষ্ট
সবুজ সংকেত !
আমাকে বাঁচাবে তুমি জেনে
এই ছদ্ম রূপকের অন্তরালে থাকি
আলোকবর্ষের আয়ু ভুলে আমি চেয়ে থাকি
নক্ষত্রখচিত এক চিঠির সন্ধানে
খাম ছিঁড়ে নিজেই প্রবেশ করছি আমি।

স্বদেশের মুখ / তারা ভট্টাচার্য্য

এপারের পাখি ওপারের গাছে বাঁধে স্বপ্নের বাসা,
দেশ-বিভাগের বোঝে নাতো মানে তাই করে যাওয়া-আসা।
আমার যাওয়ার স্বাধীনতা নেই প্রাণ কেঁদে ওঠে তাই,
উদ্‌বাস্তুর দলে ভিড়ে আমি শুধু খুঁজে ফিরি ঠাঁই।
পাখির মত যে ডানা নেই হায় মেনে চলি সীমারেখা,
হয়তো হবে না কোনদিন আর স্বদেশের মুখ দেখা।

তর্ক নয় যুক্তি / সোমনাথ কোলে

ব্যাবিলন নগরীর দেবতার নাম হোল বেল।
দেবতা জাগ্রত তাই সকলেরই বিশ্বাস অঢেল।
বেল এক সোনার প্রতিমা।
দেবতার পরমাত্মা পূজারীর অসীম গরিমা।
পারে না তো কথা বলতে! তার উপর রাজা।
যে কারণে দেবতার পূজারীকে মানতো তার প্রজা।
দেবতাকে দিতে হোত স্বাদের নৈবেদ্য নানা ভোগ।
আহার করেন সবই—নেই অভিযোগ।
প্রসাদ থাকে না পড়ে অবশিষ্ট আর
দেবতা খেতেন—ছিল প্রমাণ যে তার।
নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়ে বন্ধ হোত মন্দিরের দ্বার
পরদিন দেখা যেত সব থালা খালি সার সার।
ব্যাবিলনে দানিয়েল পরম জ্ঞানী সে এক জন।
একেশ্বরবাদী। তিনি মানেন না পূজা বা পার্বন।
দেবতা নির্জীব। পূজা করা নিরর্থক।
রাজা তো অবাক্। অত নৈবেদ্যর কে তবে ভক্ষক?

দানিয়েল প্রতিশ্রুতি দিন তিনি করবেন প্রমাণ।
পূজান্তে পূজারী পুন নৈবেদ্য সাজান।
সবার সামনে এঁটে দেন তালা চাবি।
চাবি নেন দানিয়েল। কিন্তু ভ্রান্ত হোল তার দাবি।
সকালে দরজা খুলে দেখে সবগুলো থালা খালি।
দানিয়েল আজ্ঞা পান্ মৃত্যুদন্ড। পূজারীরা দেন হাতে তালি।

দানিয়েল সময় চাইলেন আরও মাত্র একদিন।
গোপনে ছেটান গুঁড়ো চুন একটিন
পরদিন দেখা যায় মন্দিরে পায়ের কটি ছাপ।
দেবগৃহে পদচিহ্ন। চুনেতে পড়েছে যার মাপ।
পূজারী বলেন—পদচিহ্ন সব দেবতারই বটে।
বোঝা গেল আছে এক গুপ্তদ্বার মন্দিরের পটে।
রাজা খুলে গুপ্তদ্বার দেখেন সুড়ঙ্গ পথ সারি
সেই পথ ধরে চলে রাজা যান পূজারীর বাড়ি।
পূজারীই সাজতেন দেবতার প্রতিনিধি খাস
রাজা জানলেন—সব নৈবেদ্য করতেন তিনি গ্রাস।

মানুষ / স্বদেশরঞ্জন দত্ত

ভুল পরিচয় গলায় ঝুলিয়ে
ছেড়েছে পথে
ছুটছে পাগল ধুলাময় দুই
চরণ-রথে।

ওই গাঁয়েরই সেই বাড়িটা / রেখা দত্ত

ওই গাঁয়েরই সেই বাড়িটা এলাম পিছে ফেলে—
সন্ধ্যে হলে কাঁদে কি আজ খাঁটি সোনার ছেলে?
গাইছে বসে আজো কি সে—"সন্ধ্যা হোল মা।"
আঁধার ঘরে বাজে কি সেই সুরের মূর্ছনা?

নিত্য রাতে সেই বাড়িটা আমায় ডাকে কেঁদে—
স্মৃতির মণিকোঠায় রাখে হাজার পাকে বেঁধে।
আমার ব্যথার পাহাড় শুধুই কাঁটা গুল্মে ভরা;
চতুর্দিকে তারকাঁটা তার যায় না তাকে ধরা।

সেই বাড়িতে সন্ধ্যে হলে দীপ জ্বলে কি আর?
নাকি এখন চতুর্দিকে অথৈ অন্ধকার?
অথচ সেই বাড়ির মধ্যে দিনরাত্তির ধরে
সুরের খেলা চলতো—সন্ধ্যে, মধ্যরাতে, ভোরে।

আমায় কেন ডাকে আজো সেই বাড়িটা এসে,
দিনরাত্তির পাগল করে কেবল কেঁদে হেসে?
সেই বাড়িটা স্বর্গ; এখন আমার নির্বাসন?
যখন তখন পাগল কোরে কাঁদায় অবুঝ মন।

সেই বাড়িতে ভোর না হতে আসতো ছুটে রোজ—
সোনার মেয়ে, সংগে শিশু, করতো আমার খোঁজ।
বলতো আমায়—"ভোর হয়েছে এবার সাধো সুর।"
মনের মধ্যে সে-সব এখন কয়েক যোজন দূর।

ফিরিয়ে দে না সেই বাড়িটা আগের মতন কোরে—
বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখি দু'হাত দিয়ে ধরে।
আমার বুকের কান্না-সাগর শুকিয়ে যাবে সব,
সুরের খেলা চলবে, আবার, চলবে কলরব॥

বেঁচে থাকা / অনল চৌধুরী

নিঃশ্বাস নেওয়াটাই বেঁচে থাকা নয়,
বাঁচা আরো অর্থবহ—এই প্রত্যয়
হারিয়ে ছিলাম আমি কেন এতকাল ?
দিন যাপনের গ্লানি বেঁচে নাজেহাল
হয়ে শেষে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে
অকস্মাৎ অন্য এক বাঁচার অন্বেষে
চোখ মেলে চেয়ে দেখি আকাশে বাতাসে
নতুন আলোর দিশা, ভরা আশ্বাসে
এনে দিল অন্যভাবে বাঁচার আকুতি
রূপে, রসে, বর্ণে দীপ্ত অন্য অনুভূতি।

এখন বাঁচাটা আর সীমাবদ্ধ নয়
প্রহরের কালগুনে নির্দিষ্ট সময়
অতিক্রমের লক্ষ্যে ক্লিষ্ট পদক্ষেপ,
এ জীবনে না পাওয়ার জমা আক্ষেপ।

এখন সময় হ'ল ঋণ শোধবার,
অনেক পাওয়ার পরে কিছুটা দেওয়ার
সুযোগ এসেছে আজ, এ দায়বদ্ধতা
স্বীকারে সুখের স্পর্শ—আনন্দময়তা।

ভূমানন্দে বেঁচে থাকা শেষ সত্য, তাই
বাঁচার প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকা চাই ॥

জীবনে শুধু হাহাকার / জয়কৃষ্ণ দাস

আমার হাত পিছনে মেলা কালো টাকার আশায়
পিছনের দরজা খোলা কালো সোনার নেশায়।
কালো টাকা কালো সোনা এখানে সেখানে ছড়িয়ে
সবার দু'হাত কালো মনে কালো জড়িয়ে !
শেষ হলো কালোর দিন চিরদিন চলে নাতো !
জীবন বদলে যায়, চোখে পড়ার মতো।
ডুবে যাই হীনতায় এলো মেলো ছার খার,
পাইনা বাঁচার পথ জীবনে শুধেই হাহাকার।

লোকযাত্রা / তপন সেনগুপ্ত

ঘরপাশ পাখি এখন যার যারাম্বরে উড়ে
নিরুপম নিখিল বিলীন—
এই গ্রহ কাছাকাছি কবেকার এক নিহারীকা
নিরুপায় অজ্ঞাত পাখি আশ্রয় বৃক্ষ জন্য দেয়
সৌরলোক পার আরেক ক্ষেত্রজ নির্দিষ্টে
ততদিন আমার ভিটায়—বহুদিন সংসার পাশ দুঃখ বহ প্রেম
অচিন্ত নক্ষত্র আলো খসায় আলো উপর
জলচর শিকারী পতঙ্গ বৃত্তে—এ দৃশ্য
অন্ধকার বাস পিঁপড়া আমার বেশি দেখে
অশেষ সময় নাড়া নিরালম্ব কীটজ
সহস্রপদী মৃত কেয়ো দেহ খুঁটে খুঁটে
অতুল নিশাচর ভুবন শোকে—
মানুষ কাছাকাছি জলজ শ্যাওলা শরীরে
অনিঃশেষ নিয়ম পার অসম ইথর তরঙ্গ
নিয়ত আতিগভীর ভূমি ভাঙে আরেক অবসন্ন কালে
ঝাঁপা রোদ খাওয়া ধানফুল অমোঘ জলপড়া শূন্যে—
সেই রোদ মরে বায়ু কোণে

তবু আছি / নির্মলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আকাশে পাখীর মেলা, সুখে আছে সীমাহীন
সবুজের দেশে, তবু আমি, অনাবাসী, ক্ষীণ
এক বাসনার চাঙড়, বোঝা বয়ে চলি ঘাড়ে,
কোন দিন আশ্বিনের পূর্ণ চাঁদ এ দীঘির পাড়ে…
দীর্ঘিকায় জলপটে ঊর্মী শোভে হিজল শয়ণে
স্বপ্ন-বর মায়া ছেড়ে শোভাপায় নিশিত বরণে।
অঘ্রাণে ধলেশ্বরে সাগর উজানে
ওরা আছে পিরোজপুরের ডা'নে পশ্চিম পাটনে।
আমি শুধু নেই আজ সে মায়ের কোলে—
তবু আছি ; আছে আজও রাজবাড়ী দুলাল ময়রার ঘর,
নবান্ন ও পিঠে-পুলি, কাশ ও পলাশ আর
বোস মিত্তিরদের ছেড়ে বিছানো রঙীন—
মায়ার শাসন। পদতলে দূর্বা ঘাস, বাঘাজবা
শিবকলকে ফুল আর আমিনার নিযুত উল্লাস
হাতছানি পিছুটান—চাবুকে আহত ক্ষীণ অধিকার বাস।

॥ শতবর্ষে নেতাজীকে নিবেদিত দু'টি কবিতা ॥

নেতাজী স্মরণে / রবীন চক্রবর্তী

স্বাধীন ভারতের স্বত্ত্বা নিয়ে
উদ্দীপ্ত ২৩শে জানুয়ারী।
জন্মদিনের বার্ত্তা বয়ে আনে
কাশ্মীর হোতে কন্যাকুমারী।
জন্ম শতবর্ষে দেশ পরিকল্পনায় মাতে,
দলমত নির্বিশেষে অশ্রু ঝরায় তোমার নামে।
সকাল বেলা প্রভাত ফেরী
শিশু যুবা সারি সারি
সোমনারে ও সভায়
বক্তৃতার ফুলঝুড়ি।
ক্যালেন্ডারের পাতায় শুধু জন্ম দিনের ঠাঁই
মৃত্যুর সঠিক খবর আজও জানা নাই।
বিশ্বজোড়া নানা প্রশ্ন, সংবাদ ইতস্ততঃ
তাই-হুকোর বিমান ধ্বংসে সুভাষ বসু হত ?
শত মিথ্যে বাসা বাঁধে সত্যের সমাধিতে—
তুমি আছ থাকবে তুমি দেশবাসীর মনে
স্বপ্নের ভারত আজও কত দূরে ?
স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা তোমাকে স্মরণ করি
আজও ভারত ভোলেনি তোমাকে ভোলেনি বিশ্ববাসী ॥

ঘরে ফেরার ডাক / প্রদীপ সাহা

সুভাষ তুমি আশি কোটি দেশবাসীকে দিলে সুবাস,
পরবাসে যোদ্ধা বেশে আশ্রয় নিয়ে ছিলে নেতাজী সুভাষ
ফিরে এসো নেতাজী সুভাষ—বাংলার ভাই-দের পাশে
ফিরে এলে কোথায় ? নিয়তির নিষ্ঠুর ইতিহাসে !
তোমার জন্মশতবর্ষে তোমার দেশ দুঃখের জলে ভাসে
প্রতিদিন নতুন সূর্য ওঠে, শুধু তুমি নাই পাশে।

ভালোবাসি / নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জলে আর জংগলে আমাদের দেশ
আমাদের জীর্ণ বাস, শীর্ণ দেহ
দুবেলা শুধু মোটা ভাতের কাঙাল
শহুরে বিলাসিতায় আমাদের ঘুম হয় না
অথচ আমরা মাটিতে একখানা গামছা পেতে
নির্ভাবনায় ঘুমোতে পারি।
গরু ছাগলের গন্ধে আমাদের শরীর
ঘিন ঘিন করে ওঠে না
এখানে শত হাহাকারে আমাদের
ভালবাসায় ফাঁটল ধরেনা ?
লোকে বলে আমরা গেঁয়োভূত—
কথাটা আমরা অস্বীকার করি না
তাইতো সবুজে ঘেরা নিজের মাকে আমরা ভালোবাসি।

হিমালয় ঋণ / শশধর ভট্টাচার্য

সেই সে প্রথম দেখা প্রারম্ভিক জীবনের খাসজমি লনে
নিশ্বব্দ চোখের জল মেরুজ্যোতি শব্দভেদী বাণের প্লাবনে
ভেসে গিয়েছিল এক সযত্ন-প্রয়াস ভালবাসাময় যুবা
শতাব্দী প্রাচীন বাড়ি বক্স-হারমোনিআম খাল-ডুবা।

সেই সে প্রথম দেখা চাঁদের আলোয় ভেজা মমতার মুখ
তার চোখ, ঠোঁট, ছোট্ট হাসির ভেতর ছিল নির্লিপ্ত চিবুক
সেই মুখে যেন চির-শাশ্বত স্নিগ্ধতা ভরা হিমালয় ঋণ
গোম্ফায় গোম্ফায় বসে বৌদ্ধলামা উপাসনা-চক্র প্রতিদিন।

সেই সে প্রথম দেখা সত্তরের দশকের উত্তাল সময়
গ্যালারি ঝলমল ছবি সীমানা ডিঙিয়ে ওঠা প্রকৃতি নির্ভয়
বেতের ডালায় ফুল লাবনী মুখের ভাঁজে কেপে ওঠে ছায়া
পাতার আড়াল থেকে কার হাসি ভাসে একি পাহাড়ের মায়া
টেনে নেয় কাছে তবু বুঝিনে পাথুরে মাটি তার ধূসরতা
গোলাপি আলোর ভোরে কখন যে ধস্ নামে বরফশুভ্রতা।

জন্মভূমি / দেবব্রত দত্ত

কোথাও যাবার কথা ছিলো
যাওয়া হয় নাই ;
যে ফিরে আসবে বলেছিলো
সেও ফেরে নাই।

দরজা দুটোই আছে খোলা
ঘর আর বার
যাওয়া যায় ইচ্ছে মতো চলে
অপার বিস্তার।

পুবে কি তোমার জন্মভূমি ?
পশ্চিমেও আছে তবে কারো।
জন্মভূমি ছিলোতো আমারও
আজ কেন স্মৃতির বিকার ?

অথচ মানুষ জানে আজো
জন্মভূমি অভিধার মানে—
কোনোখানে এখনও দোয়েল
গান গায় ফুলের বাগানে।

প্রশ্ন / রতন চট্টোপাধ্যায়

সকলেই হেঁটে যাচ্ছে অবিরাম যে যার মতন,
সুখদুঃখ, একা একা নিঃসঙ্গ দুপুর।
হাঁটছে ফুলের সঙ্গে সুনিশ্চিত কাঁটার দংশন ঃ
চোখের সামনে দিয়ে যতো গাছপালা,
লতাগুল্ম, ঘাস গাছ সব দগ্ধ দিন,
ইতস্তত ঃ কাঁকড় পাথর।
মাঝে মাঝে ভিজে যাচ্ছে মাটি, মাঝে মাঝে
রক্ত চিহ্ন সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় পুকুরের জলে।
অথচ এমন কেউ নেই—
যে পারে মুছিয়ে দিতে বুক থেকে এ সমস্ত দাগ,
অনায়াসে বলতে পারে শিশুর মতন ঃ
এতো রক্ত কেন ?

দুই বাংলা / অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন

পনেরো, ষোল আর একুশ—
আগষ্ট, ডিসেম্বর আর ফেব্রুয়ারী—
ভারত বিভাগ, স্বাধীন বাংলাদেশ আর বাংলাভাষা—
বাঙালীর রক্তে ভেজা ক্যালেণ্ডার আর ইতিহাসের কিছু পাতা,
আমাকে ডাকে।
ইংরেজের শোসনের পর পাক সেনার অত্যাচার
নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের পর বঙ্গবন্ধু মুজিবের আহ্বান

রাইফেল, মেসিনগানের সামনে জনতার গর্জনে
দুই বাংলা রক্তে হয় পিচ্ছল।
অন্ধকার থেকে আলোয় আসার প্রতিযোগিতায়
বাঙালী জিতেছিল, জিতেছে, জিতবে।

পুরানো, গলিত, জীর্ণ পৃথিবীতে
বাঙালী জ্বালায় অনির্বান দীপ শিখা।

পোষ্টকার্ড / রাজা রায়

নীল কাগজের চিঠি
বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি
রাংতা মোড়া খাবার ক্যাডবেরী
ভোলানো যাবে না
ছড়ানো-ছিটানো শব্দে জীবন
ভিসুভিয়াস, প্রজন্ম, সাবধান,
কম্পিউটার, সমাজ, সবুজ।

একুশে ফেব্রুয়ারী / অনুস্মিতা বর্ধন

প্রতিটি বছর আসে একুশের সেই ফেব্রুয়ারী,
মনে পড়ে পাক সেনাদের বাড়াবাড়ি
বাঁচিয়ে রাখতে বাংলা ভাষার সম্মান,
ওপার বাংলায় বলি হল কত প্রাণ।
এপার ওপার বাংলা এ হৃদয়ে দুই বাংলা এক,
পদ্মা ও গঙ্গার মাঝে যতই থাকুক না ফারাক।

আঁচল ওড়ে / সত্য বসু

মায়ের আঁচল উড়ে পড়ে
কাঁটাতারের বেড়ার উপর

বাতাসে গুঁড়ো শিশির
সবুজ ছাতিমতলায় কাঁচপোকা

গঙ্গা পদ্মা মেঘনায় চর ভাসে
খল খল খল খল…

স্বাধীনতার রূপরেখা / ডলি দত্ত

তুমি স্বাধীনতা চেয়েছিলে জলপাই কাঠ ভেঙ্গে,
স্বাধীনতা—ভরদুপুরে বৃষ্টি ভেজা ইচ্ছেগুলোর
স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন দেখায় সারাটা দিন চোখ ছল ছল
নিষেধ ভাঙ্গার ঋতু ছুঁয়ে, সে-উড় খই, গবিন্দায় নমঃ
দেশটা এখন দুইটুকরো গল্প বলার, গল্প শোনার
মুখোমুখি ; সারাটা রাত হাতড়ে হাতড়ে খেলাঘর
পঞ্চভূতের অহংকারে দেশটা এখন দুই টুকরো
ইটালিয়ান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
দুইটা মাতাল মানুষ গতকাল
সমস্ত রাত তর্ক করেছে
কুয়াশাময় নির্জনতায়
ওদের সবাই হারিয়ে গেছে
প্রেম প্রীতি আর অস্তিত্ব ভালোবাসাময় যৌবন
রোদের ওমে ছড়িয়ে পড়ে নাকি
বোবাকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আকাশমনি গাছটা ;
এই তো গেল দুই মাতালের মানুষের গল্প ।
স্বাধীনতা, তখন তোকে দেবো ভবিষ্যৎ
ধর্ম নয়, লোক লৌকিকতা নয়—
শুধুই ভবিষ্যৎ ।

বৃত্তান্ত / কৃষ্ণা রায়

বুঝতে পারছি এখন তোমার
চলে যাওয়ার সময়
শব্দে মন্ত্রের উচ্চারণ,
একটু ভালোবাসতে শিখলে—
ধুলোতে ফুলের গন্ধ পেতে
বুকের ভিতর উৎস মুখে পাথর দিলে ।
শুরু থেকেই বেতস বৃত্তি—
অনন্তকাল ধানভানতে শিবের গীত
যাঁতাকলে কলাই পেশা ।
সেবার গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরার সময় হলে
তে-চোখা এক মাছের ঝাঁক
ইশারায় পাণ্ডুলিপি দিলে ।
তোমার সঙ্গে আলাপের সেই ছিল সূত্রপাত
তারপরতো জলগড়ালো দেশ বিদেশে
সঙ্গে নিয়ে আনাড়ি এক গড় ঠিকানা
অবশেষে দক্ষিণ দেশে
জাহাজ দেখে মন টানলো গাঙের পাড় ।
বদলে গেলে ঘর……
অহর্নিশ জল পড়ে বুকের ভিতর
তখন সব জলছবি মুছে—অমিয় অশালীন ।

রাজনীতির ছড়া / চিত্রা অধিকারী

সাইকেল, সাইকেল চড়ে আসে মাইকেল
কাঞ্জিলালের মেসো কেণ্টসুদেন ;
হরতাল হরতাল পথে বাজে খরতাল
রান্না ঘরেতে আছে পঞ্চব্যাঞ্জন ।

ফুটবল, ফুটবল এক সাথে সবে বল—
রাস্তায় হুটোপাটি করে নন্দন ।
হরতাল, ছুটি ভাই আয় সবে জুটি ভাই
হ্যাপি হরতাল বলো যতো সজ্জন ।।

আমার বাংলা / মিতশ্রী নাগ

উজ্জ্বল যৌবনা আমারি বাংলা মা
প্রকৃতির সৃষ্টি নীলাভ ও শ্যামলা।
সোঁদামাটি গন্ধে মা আমার আদরিণী
পদ্মা ও গঙ্গার বুকে মা তরঙ্গিনী।
স্নিগ্ধ পরশে থাকো লেখকের কলমে
শক্তির সেবা রাখো বীর সন্তান মনে।
তোমারি বাতাসে মাগো তোমারি আকাশে
সেই ভালোবাসা যেন রক্তেতে ভাসে।
জননী বাংলা তুমি স্বার্থক জনম ভূমি
তোমারি আঁচল যেন ধরে থাকতে পারি।

ঠিকানা / গালিব ইসলাম

ধুলোবালিকাদা হেঁটে হেঁটে হেঁটে
হাঁটুতে ক্ষত রক্ত পড়ে রক্ত ঝরে রক্ত
কোথায় পৌঁছুতে হবে কোন পথ বলে দেবে
পথের ঠিকানা জানা নেই জানি না
পথের অন্ধকারে শুদ্ধ হই বেপথু পথিক
বসন্ত বাতাস ওড়েনা ঠিকানা মনে পড়ে না
ঠিকানা ঠিকানা ঠিকানা ঠিকানা

তোমার জন্যে / রমিতা মজুমদার

তুমি আমার রাত পেরোনো সূর্য-ওঠা ভোর,
তোমার জন্যে খোলা ছিলো সব জানালা দোর।
তুমি আমার কান্না-হাসি, ব্যথায় প্রলেপ—সব।
তোমায় পেয়ে গেছে থেমে দুঃখ বাঁণার রব।
হারাই হারাই ভয়েই থাকি, তোমাকেই তো চাই!
মনের সুধায় গড়বো তোমার সমস্ত সত্তাই।
তোমার হাসি ভরিয়ে তোলে আমার সকল সাধ—
তোমার ডাকে সাড়া দিতে, সমস্ত কাজ বাদ।

দুঃসহ ব্যথা / রবীন চক্রবর্তী

উদাস চোখে তারার পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবিস কি তুই মেয়ে,
দু চোখে কেন চোখের জল ধারা
আজকে কি তুই হাঁল আপন হারা
পথিক কি তার পথে গেছে চলে
তোর বুকেতে স্মৃতির ব্যথা ফেলে
স্মৃতি-ই যে তোর প্রাণের পরশমণি
তোর বুকেতে রইলো সোনার খনি
কে আর সুখী আজকে রে তোর চেয়ে
তবে কেন কাঁদিস পাগল মেয়ে ।।

কবিতার বইমেলা / গৌরীশংকর সরকার

আমার সকাল ভিজেছে রাতের কান্না নিয়ে
আমার দুপুর পুড়েছে সূর্যের তাপদাহে,
আমার গোধূলি বলছে রাত্তিরে নেই কাজ,
বাসীফুল, সামিয়ানা দাঁড়, সব একাকার আজ।
আমি আছি শুধু নিভে যাওয়া মাটির প্রদীপ হয়ে,
ঝরা পাতা, মরা ঘাস, আর আঁধারকে সাথে নিয়ে।
ধুলোয় বোঝাই ময়দানের এদিক ওদিক আশে পাশে,
এক কোণে রাখা লিটল্ ম্যাগাজিনের ঠাসাঠাসি করা লাশে।
মুখ বুজে আমি পড়ে আছি ওই স্টলটার এক কোণে,
আমার সকাল সন্ধ্যে কেটে যায় শুধু চেয়ে আকাশের পানে,
ধুলোর ঝড়েতে, অন্ধকারেতে, শিমুলগাছটা কালো
সকাল দুপুর শেষ হয়ে রাতে আমার কান্না এলো।
কবিতা শুনুন, কবিতা পড়ুন, কিনুন কবিতার বই,
চীৎকারে ভরে আকাশ বাতাস, কিন্তু ক্রেতারা কই?
আওয়াজ উঠছে, বইমেলা তুমি, আমার তোমার সবাকার,
কোনও কবি আছে যে পারে বলতে, বইমেলা কবিতার?

চেতনা আনুক ২১শে ফেব্রুয়ারি / দীপককুমার গুপ্ত

স্মরণীয় আর বরণীয় দিন একুশে ফেব্রুয়ারি।
মাতৃভাষার মান রাখতে প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি—
হয়েছিল তরুণ-তরুণী মাঝে পূর্ব পাকিস্তানে,
হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানে ধর্মভেদ না মেনে।
বাহান্ন সালের সেই দিনটা বাঙালীর গৌরব।
অন্যায়ের প্রতিকারে সেদিন কী মহাবিপ্লব!
বিদেশী ভাষার দমন নীতির ফল হয়নি শুভ,
গর্জে উঠলো শত-সহস্র তরুণ তরুণী-যুবা।
তরতাজা প্রাণ হলো বলিদান, শহীদ চার তরুণ,
জব্বর, সালাম, রফিকেরা সব দিল যে তাদের খুন।
পাকিস্তানের শাসক-শোষক পারেনি কেড়ে নিতে—
বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর আশা স্তব্ধ করে দিতে।
জাতি টিঁকে থাকে মা, মাটি, মাতৃভাষা, সংস্কৃতি নিয়ে,
পূর্ব-পাকিস্তানীরা পেল সে ইনাম প্রাণ দিয়ে।
ইতিহাসে সোনার আখরে রইলো লেখা সে গাঁথা—
স্বদেশী ভাষার মানরক্ষায় আত্মত্যাগের কথা।

জন্মভূমি / প্রেমাংশু দে

খণ্ডিত হয়েছো তুমি লুটেরার হাতে!
তোমার সন্তান সব আছে দুধে ভাতে?
তোমার শাসন ভার ক্রমান্বয়ে আসে নানা হাতে
তবু ফেরো ভিক্ষা পাত্র নিয়ে দিনে রাতে
শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র, তুমি কাঁদো দুখে।
তোমার লুণ্ঠিত অর্থ শাসকের লোহার সিন্দুকে।
আমার মায়ের দেহ কবে পুড়ে হয়ে গেছে ছাই!
মাতৃহীন, স্নেহ মমতার ছায়া কোনখানে নাই।
সুদূরের হাতছানি তবু আসে—বারে বারে কেঁপে উঠে বুক—
পায়ে বেড়ী, কাঁটা তারে ঘেরা সে অ-সুখ,
রাইফেল, মেসিনগান—মুখ ফিরিয়ে থাকি
কল্পনায় বসে বসে আঁকি
তোমার ধূসর ছবি, তোমার প্রতিমা
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ তুমি জন্মভূমি মা॥

শপথ / পাঁচুগোপাল রায়

রজত জয়ন্তী বর্ষে ঘরে ঘরে দীপালি উৎসব
মসজিদ মন্দিরে নানা মতে আরাধনা
"আমার সোনার বাংলা" গানে গানে মুখর প্রান্তর
বাঙলা ও বাঙালী সত্য, পৃথিবীর অনন্য বিস্ময়।

দুবাংলার শহীদেরা মেতেছিল মহান উল্লাসে
অত্যাচারী দুর্গীঘরে এসেছিল মহাঘূর্ণি ঝড়
সারাদেশে জেগেছিল প্রাণদানে দুর্লভ মাতন
এক-নদী রক্ত দিয়ে পাওয়া মহামূল্য স্বাধীনতা।

মুজিব বিদ্রোহী নেতা, গণতন্ত্র পূজোর ঋত্বিক
ধর্মনিরপেক্ষ দেশ সৃষ্টি নিয়ে অপূর্ব সাধনা
বাবা-মার রক্ত ছুঁয়ে জাগরণী তাঁর তূর্যনাদ
কঠিন রক্তাক্ত-পথে সূর্যদীপ্ত কঠিন সংগ্রাম।

পঁচিশ বছরে হোক সবই ভেদাভেদ ভুলে একমাত্র পথ,
শহীদের বেদীস্পর্শে প্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষার শপথ॥

একুশের মা / চন্দনকুমার বৈদ্য

একুশের প্রত্যুষে শুয়ে থাকা বন্ধ ঘরে
সহসা দেখি বাতায়নে দুলুনি।
মনে হয় অজস্র ক্রুদ্ধ বাতাস
প্রবেশের জন্য করে ছট্‌ফট্।
জানালা দিলাম খুলে,
হু-হু করে এলো বাতাস, কল্লোলগেল থেমে।
সে বাতাসে করলাম স্নান
শুনতে পেলাম কতগুলো নাম
বরকত-আবুল-রফিকউদ্দিন, জব্বার-সালাম।
আরামে চোখ বন্ধ করলাম। চোখ খুলে দেখি
এক গুচ্ছ লাল গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি
চোখে তাঁর চুয়াল্লিশ বছরের অশ্রুধারা
তাকিয়ে আমার দিকে—আমি চিনতে পারলাম—
আমার মা, আমার একুশের মা!

বইমেলা ১৯৯৭

একুশের রক্তে / আশরাফুল মান্নান

একুশের সেই রক্ত ঝরানো পলাশ ফোটানো দিনে
আমরা পেয়েছি সোনালী সকাল নিজেকে নিয়েছি চিনে
বুকের আশাকে মায়ের ভাষাকে আমরা পেয়েছি মুখে
বিপদে আপদে অসীম সাহসে দাঁড়াতে শিখেছি রুখে।

একুশের সেই রক্ত ঝরানো তন্দ্রা ভাঙ্গানো দিনে
আমরা জেগেছি যুদ্ধে লেগেছি দেশকে নিয়েছি চিনে।
এগিয়ে চলেছি শান্তি পেয়েছি বর্ণমালার গানে
শপথ নিয়েছি একতা গড়েছি শোষণের অবসানে।

একুশের সেই রক্তে দেখেছি আমার দেশের নাম
যে নামের সুরে বিউগল বাজে অম্বরে অবিরাম।

মায়ের ভাষা / আমিরুল হক

বাংলা আমার মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলি
বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে বুক ফুলিয়ে চলি।
এই ভাষাতে দুঃখ সুখের লিখি যত গান
মধুর সুরে গাই যে আহা ভরে সবার প্রাণ।
মায়ের মতো দেশের মাটি মায়ের মতো ভাষা,
মা যে আমার আদরিনী আমার ভালোবাসা।
ধন্য আমি ধন্য মাগো ধন্য দেশের মাটি—
বাংলা ভাষা আমার কাছে সোনার চেয়ে খাঁটি।

ভ্রান্তির অমোঘ লগ্ন / ইমামুর রশীদ

ভ্রান্তির অমোঘ লগ্ন অবশেষে। আশ্চর্য নির্জ্ঞান।
একটি পাখির মতো মুগ্ধ হ'য়ে আকাশের গান
কান পোত শুনে যাই ; বুঝি কোনো প্রাচীন প্রাসাদে
অলৌকিক ঘণ্টা ঐক বেজে ওঠে গভীর নিথাদে
মধ্যরাতে ভয় পেয়ে সহসা বাইরে ছুটে আসি
ধ্রুবের সমিধে ধ্যান অগ্নি জেলে মন্ত্রের বিলাসী
দেখি এক, বসে আছে অন্ধকারে আলোর ভিতর।
ভ্রান্তির অমোঘ লগ্ন অবশেষে বিজয়ী ঈশ্বর।

একটি পাখি / মাহবুব রহিম

অনেক পথ পেরিয়ে এলো একটি পাখি
আকাশ দেখে বেড়িয়ে এলো একটি পাখি
জলের ঘ্রাণ চোখের মাঝে বুকের মাঝে
মেঘের দেশ ছাড়িয়ে এলো একটি পাখি।

অনেক কথা বুকের মাঝে চোখের মাঝে
নীলের ঢেউ উথাল হয়ে পাখায় বাজে
অনেক রঙ ছড়িয়ে পড়ে স্বপ্ন হয়ে
আকাশ জুড়ে মেঘের মাঝে তারার মাঝে।

তোমার কাছে কি দেখে যে মত্ত হয়ে
সবুজ মাঠ হারিয়ে এলো একটি পাখি
অনেক বাধা মাড়িয়ে এলো একটি পাখি
মেঘের দেশ ছাড়িয়ে এলো একটি পাখি।

ইচ্ছে করে /যাকারিয়া খান

ভাল্লাগে না আম্মু যখন বলে—খোকা পড়
আমার কেবল ইচ্ছে করে ছেড়ে যেতে ঘর।
ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলি ভুগোল, ধারাপাত
জোনাক হয়ে চাঁদের সাথে দেই কাটিয়ে রাত।

ভাষা / গোলাম কিবরিয়া পিনু

ভাষার নামে বদ মেজাজি করবে ভাষা খুন,
রক্ত দিয়ে মান রেখেছি তাদের মুখে চুণ।
চুন যে এখন নিজের মুখে নিজেই নিজে মাখি,
আমরা যে ভাই সেই ভাষাটা দূরে ঠেলে রাখি।

মিছিল মানে / মোহাম্মদ ওয়াহিদ আসিফ

মিছিল মানে মিছিলকারী জীবন মরণ প্রশ্ন.
মিছিল মানে আমার মৃত্যু তোমার বাঁচার জন্য।
মিছিল মানে লাল পতাকা সাম্যবাদের মন্ত্র.
মিছিল মানে আঁকড়ে ধরা শেকল ছোঁড়ার যন্ত্র।

'অতন্দ্রপথ'-এর কথা

বাংলাভাষা আমাদের হৃদয়ের প্রকাশপথ। আমরা মাতৃভাষার পরিচয় নিয়ে অত্যন্ত আপনার করে ভেবেছি, ভাবছি। এই ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতাকেই সাহিত্য-চিন্তার প্রথম শর্ত বলে মানি।

সমাজ মাতৃ নির্ভর; সমস্ত সাধু প্রয়াসে সমাজবাদীরা সহজেই নিজেদের যুক্ত করতে জানেন। সংবেদনশীল মন আমাদের মাতৃভাষা, বাঙলার প্রতি বাঙালি জাতির প্রতি ভেতরে ভেতরে অলক্ষ্য টান অনুভব করি। অজস্র সুখের কথায় নিবিড় আত্মীকবোধ এবং অতল অনুভূতি আমরা ঐতিহ্যে রাখতে পারি, অর্থাৎ শরীরে রোদ আসলেই বোধ আসবে।

সুনীল আকাশে মেঘের গর্জনে-বর্ষণে মায়াবী সুর শোনার মতো বাংলার হাওয়া বাতাস জানিয়ে দেয় মনে করিয়ে দেয় মাতৃভাষা কত অপরূপ অবলম্বন! বিশ্বাসে শুদ্ধ হ'য়ে আমরাই পেয়ে যাই সত্যের দেখা। এই সত্যেরই প্রতিমা বাঙালির কাছে বাংলা।

শ্রদ্ধা-ভালোবাসা জীবনে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত। এই হৃদয়ে জেগে আছে সুখের আলো—উদয়াস্ত ভালোবাসা ঘিরে থাকে ফলবতী গাছের মতো, ভালোবাসার বাতাস গাঢ় হয়—এমন করেই অতন্দ্র ভরসা বিশ্বাসকে সমৃদ্ধ করে।

এই ভরসা অবলম্বনে 'অতন্দ্রপথ' বর্তমান সংখ্যাটি বাংলাভাষা মাতৃভাষার চেতনায় আর বাংলাভাষা-শহীদদের স্মরণে নির্মিত।

বরুন চক্রবর্তী

With best Compliments :

Krishna Chemicales

Raipur 24 Parganas (South)

Manufactures of Detergent Cake & Powder.

'অতন্দ্রপথ' পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনায়
জনৈক শুভাকাংক্ষী

অতন্দ্রপথ সরকারী অনুমোদন নং WBBE NO 8737/41/AL/TC/94

আমাদের এই কথা

- লেখক আর পাঠকরাই 'অতন্দ্রপথ' সাহিত্য পত্রিকার প্রাণশক্তি।
- নতুন লেখকদের প্রাসঙ্গিক লেখা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয় 'অতন্দ্রপথ' সাহিত্য পত্রিকাতে।
- মৌলিক রচনা 'অতন্দ্রপথ' সাহিত্য পত্রিকায় গ্রহণযোগ্য।
- 'অতন্দ্রপথ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখার পরিমার্জন এবং সংস্কারের জন্য নির্বাচক মণ্ডলীর অবাধ স্বাধীনতা। মেদবর্জিত লেখাই মনোনয়নের অধিকারী।
- দীর্ঘ স্ফীত লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ যোগ্য নয়। পাণ্ডুলিপির কপি রেখে পাঠান।
- আশা করা যায় তত্ত্বগত বিষয়ের চাইতে বাস্তব দিক্‌গুলোর উপর বেশি-নিবন্ধ লেখা নিশ্চয় পাঠাবেন।
- পাঠক-লেখক সহ 'অতন্দ্রপথ' সাহিত্য পত্রিকায় সমস্ত প্রিয়জনদের উন্নত পরামর্শ সহযোগিতা আমদের পাথেয়।

অতন্দ্র সাংস্কৃতিক সংসদ
(সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন)
অতন্দ্রপথ সাহিত্য পত্র
৩/৭৮, আজাদগড়, রিজেণ্ট পার্ক, টালিগঞ্জ
কলিকাতা-৭০০০৪০, ফোন-৪৭১-৭৬৯২

Edited by Barun Chakraborty, Publised by Sri Tapon Sen Gupta from 73, Nehru Colony, Calcutta-700040 and Priented by R. Roy 51 Jhamapukur Cal-9

Price Rs. 7.00